সংবাদ

তারিখ ... 29 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ১ ...

শিক্ষা খাতের বাজেট নিয়ে ভাবনা

এনায়েত আলী বিশ্বাস

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কথাটা কাগজে কলমে যতবেশি বলা হোক না কেন বাস্তবে তার প্রতিফলন কিন্তু তেমন ঘটেনি। বিশ্বের উন্নত দেশগুলো তাদের শিক্ষা খাতে বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করে থাকেন। আমাদের পাশের দেশ ভারত। ভারত খুব বড় ধনী দেশ না। বরং ওদের চেয়ে অনেক ইনডেক্সে আমরা এগিয়ে আছি। অথচ ওদের জিডিপির ৪% শিক্ষা খাতে বরাদ্দ। মালয়েশিয়াতে ৫.৯% বা ৬%। মালদ্বীপের হলো ৮.৫%। আমাদের দেশে ২.২% মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। শিক্ষার উন্নয়ন ঘটাতে হলে জিডিপির প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হবে। শোনা যাচ্ছে, চলতি অর্থ বছরে বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দ ১৫% কাছাকাছি আনার চেষ্টা চলছে। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই ২০ শতাংশের বেশি শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ থাকে। আমাদের শিক্ষা খাতে এজন্য বাজেট বাড়ানো দরকার। যাতে ২০২১ সালে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৪১ সালে উন্নত দেশে উন্নিত করতে হলে দক্ষ জনশক্তি দরকার। দক্ষ জনশক্তি যদি বরাদ্দ না রাখা যায় তাহলে সম্পদ তৈরি করা যাবে না। আমাদের মোট জনসংখ্যার ২৬% হলো ছাত্র বা যুবক। এটা একটা বড় সংখ্যা। এদের যদি আমরা মানুষ করতে পারি তবেই উন্নত দেশের যে প্রত্যাশা তা পূরণ করতে পারব। এদিকে মানসম্মত শিক্ষা এবং মানসম্মত শিক্ষক এবং ক্লাস রুম যদি না থাকে তাহলে শিক্ষা উন্নয়নের কথা যতই বলা হউক না কেন কিছুই হবে না। কিন্তু বর্তমানে ক্লাস রুমে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি কম। কোচিং সেন্টারের সংখ্যা দেশের মোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি। ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না থেকে এসব কোচিং সেন্টারকে বেশি লাভজনক মনে করেন। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ম মাফিক ক্লাসের ঘন্টাদেয়, শিক্ষকরা ক্লাসে যান। যে কয়জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে চাকরি বাঁচানোর জন্যে তাদেরকে নিয়ে ক্লাসে সময় কাটান। বিশেষ করে কলেজের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে কার্যকরী। কলেজে এখন কলেজিয়েট এবং ননকলেজিয়েট এর বালাই নেই। পরীক্ষায় ফরম পূরণের সময় তারা কত শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয়াতে পারে সে প্রতিযোগিতা চলে। অনেকবার সরকার কোচিং বাণিজ্য বন্ধের জন্য ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু কোন বারই তা কার্যকর করতে পারেনি। অথচ সরকার হাজার হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা শিক্ষা কর্মচারীর জন্য ব্যয় করছেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হচ্ছেনা। শুধু বছরে একবার ফাইনাল পরীক্ষা নিয়ে সার্টিফিকেট দেয়ার ব্যবস্থা করা ছাড়া বছরের অন্যান্য সময় তীর্থের কাকের মতো হা করে বসে থাকা ছাড়া কোন গত্যন্তর থাকে না। এর ওপর বাজেটে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়াতে দাবি উঠছে। অন্যান্য দেশ যখন শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে শিক্ষার হারের সাথে মান বাড়াতে ব্যস্ত, আমরা তখন পাশের হার বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। সরকারও উচ্চ শিক্ষার হার বাড়াতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে শিক্ষার মানকে আরোও নামিয়ে এনেছে। যে কারণে অন্যান্য দেশের শিক্ষার্থীরা আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন পড়াশোনা করতে আসে না। এমনকি এদেশ থেকে পাস করা সার্টিফিকেটধারীদের অন্য রাষ্ট্র মূল্যায়ন করে না। সেখানে পড়তে হলে তাদের মত আবারোও কোর্স করতে হয়। তবু দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার প্রবণতা কমেনি। ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনও এমপিওভুক্তির আশায় বছরের পর বছর অপেক্ষায় আছে। বোর্ডসমূহ এদেরকে একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করেছে। দীর্ঘ বছর এমপিওভুক্ত না হওয়ায় অনেক শিক্ষক অনত্র কাজ বেছে নিয়েছেন। যে ক'জন শিক্ষক অবশিষ্ট আছেন তারাই সব জাম্ভার মতো সব সাবজেক্টে শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

শিক্ষা খাতে অপচয় বেশি হয়। শুধু এমপিও ভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন নয় শিক্ষা কাঠামোর অবকাঠামো উন্নত ও শিক্ষার মান উন্নয়ন খাতে বাজেটে প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু এসব প্রকল্প সময়মতো শুরু না হয়ে পরবর্তী বাজেট পেশের পূর্বে তড়িঘড়ি করে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের চেষ্টা নেয়া হয়। ফলে নানান অনিয়মের ঘটনা ঘটে থাকে। ক্রয় প্রক্রিয়া উপেক্ষা করেই দরপত্র আহ্বান ছাড়াই শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রচারনার কাজ দেয়া হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে। গত বছরের তুলনায় এবার প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিও কম। লক্ষ্যে পৌছাতে কয়েকটি প্রকল্পে ব্যর্থতা চিহ্নিত হলেও যে কোন মূল্যে ঐ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের পরামর্শ দিচ্ছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। তবে ঘন ঘন কর্মশালার আয়োজন করে মোটা অংকের সম্মানী ভাতা দেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষা সচিব সম্প্রতি এক সভায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক করে বলেছেন, 'অনিয়ম করলে কাউকে ছাড় নয়। সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতি করার ইচ্ছা থাকলে অনত্র চলে যান।' কিন্তু অতীতে শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রকল্পের টাকা নিয়ে নয়-ছয় হয়েছে। অথচ এই অর্থের কিছু অংশ ব্যয় করলে দীর্ঘদিন থেকে এমপিওর আশায় ঝুলে থাকা ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা যেত। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হত প্রায় লক্ষাধিক শিক্ষক কর্মচারী। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নও ঘটতো। এদিকে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরএডিপির জন্য এক হাজার কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়া হলেও ব্যয় করা যাবে না এই অজুহাতে ঐ প্রস্তাব নাকোচ করা হয়। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) বলেছেন, 'অর্থ বছরের প্রথমে এক হাজার কোটি টাকা দেয়া হলে আমরা তা ব্যয় করতে পারতাম।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অনুবিভাগের তথ্যানুযায়ী ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) মন্ত্রণালয়ের আওতায় ৭৩টি প্রকল্পের জন্যে চার হাজার একশত ছাব্বিশ কোটি তিপ্পান্ন লাখ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। প্রকল্প সমূহের অনুকূলে গত জানুয়ারি পর্যন্ত মোট অবমুক্ত করা হয়েছে দুই হাজার অষ্টাশি কোটি তের লাখ টাকা যা মোট বরাদ্দের ৫১ শতাংশ। এই সময় ব্যয় হয়েছে এক হাজার দুইশত তিতাল্লিশ কোটি দুই লাখ টাকা, যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৩০ শতাংশ। গত অর্থ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের (এডিপি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি ছিল ৪১ শতাংশ। মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা গেছে, গত ১ মার্চ পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) অধীন বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি ৩৪ শতাংশ। শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) ২৮ শতাংশ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ২৬ শতাংশ এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অগ্রগতি ১৪ শতাংশ। এর মধ্যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের, ইউজিসি ও ব্যানবেইজের আর্থিক অগ্রগতি শতভাগ মিলে যাওয়ায় নানান প্রশ্ন উঠেছে। এ বাপারে নাম না প্রকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের একজন কর্মকর্তা জানান, 'তিন সংস্থার আর্থিক অগ্রগতি কোন ক্রমেই শতভাগ হতে পারে না। তিন সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা পরস্পর যোগসাজশে এই অগ্রগতি নির্ধারণ করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এটি প্রকৃত তথ্য না-ও হতে পারে, এর মধ্যে অনিয়ম থাকতে পারে।' এছাড়া সরকার তো নীতি উপেক্ষা করে দরপত্র ছাড়ায় সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে ৪৪ কোটি টাকার শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি টি টি পি ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়া অভ্যাস গড়ে তোলার দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে দেয়া হচ্ছে। প্রকল্পের এ সংক্রান্ত বিষয়টি একনেকের সভায় অনুমোদন ও দেয়া হয়েছে। প্রকল্প কর্মকর্তা মাউশী ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা দরপত্র ছাড়া বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রকে কাজ দেওয়ার বিরোধিতা করলেও একটি প্রভাবশালী মহলের চাপে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় তড়িঘড়ি করে প্রকল্প একনেক সভায় তোলা হয়। তবে প্রি-একনেক সভা ও মাউশীর মতামত উপেক্ষা করে প্রকল্পটি একনেক সভায় উপস্থাপনের কারণ সম্পর্কে অনেকে বলছেন, 'এ বিষয়ে প্রি-একনেক সভা হয়নি। ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে ও তোলা হয়নি। তবে একনেক সভায় অনুমোদন হলে প্রকল্পের পক্ষে কিছুই করার থাকে না। তবে প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হওয়ার প্রায় সাড়ে তিন বছর পর তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষা মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজ সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন ১৫০০ কলেজের মধ্যে ৫০টি কলেজের উন্নয়ন কাজ বন্ধ রেখেছে মাউশী। পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী না থাকা সত্ত্বেও– ঐসব কলেজে ৪ তলা ভবন নির্মানের জন্য মনোনীত করা হয়। তদুপরি কর্মকর্তাদের অদক্ষতা ও দূরদর্শিতার অভাবে এস্টাব্লিস্টমেন্ট অব অটিস্টিক একাডেমী প্রকল্পের কাজ ও এগোচ্ছে শম্ভুক গতিতে। এ নিয়ে মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ। ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে গত মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মাত্র এক কোটি ৩৪ লাখ নিরানব্বই হাজার টাকা, যা বরাদ্দের ৯ শতাংশ মাত্র। এই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ব্যয় করা যাবে কিনা তা নিয়ে স্বয়ং মাউশী কর্মকর্তারা সন্দিহান। মাধ্যমিক শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা মোবাইলের মাধ্যমে বিতরণ করায় জটিলতা দেখা দিয়েছে। শুধু এক্ষেত্রে নয়, শিক্ষা ও শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে জটিলতা কম নয়। কোন অর্থ বছরের প্রথম থেকে প্রকল্পের টাকা ছাড় দেয়া হয় না। অর্থ বছরের শেষ সময়ে এসে তড়িঘড়ি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কোন কাজে আসে না। নয়-ছয় হবার সম্ভাবনা বেশি। সে ক্ষেত্রে ঐ টাকা ঐ প্রকল্পে আর ফেরত যায় কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়ে যায়। ফলে শিক্ষাখাতের উন্নয়ন প্রশ্নবিদ্ধই থেকে যায়। পরবর্তী অর্থ বছরে এ খাতে পূর্বের বছরের ন্যায় একই অবস্থা থেকে যায়। বাজেটে শিক্ষাখাতের টাকা বরাদ্দ করলেই হবেনা। সে অর্থ ঠিকমতো ব্যয় হচ্ছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। দরকার কোন খাতটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেটি চিহ্নিত করে তার সফল বাস্তবায়ন। কিন্তু আমাদের দেশে তা করা হয় না। দেশ স্বাধীনের পূর্বের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পর ৪৬ বছর কেটে গেছে। ২০১০ সালে জাতীয় সংসদে পাশ হওয়া সর্বশেষ শিক্ষানীতি আজও কার্যকর হয়নি। গোজামিল দিয়ে চলছে শিক্ষা ব্যবস্থা। আর যেখানে গোজামিল দেবার প্রবণতা, সেখানে বিশৃঙ্খলাতো হবেই। অবসরপ্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসর ভাতা গত কয়েক বছর ধরে পাচ্ছেন না ভুক্তভোগীরা। ফলে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে তাদের। অথচ শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত প্রচুর অর্থের অপচয় হয়। এই অর্থ অন্য খাতে ব্যয় করে কিছু কিছু সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই কারো। শিক্ষামন্ত্রী মাঝে মাঝে ভালো কথা বললেও তিনি তা কার্যকরী করতে পারেন না, কেন জানি না। অবশ্যই একটা মন্ত্রণালয়ের কাজ টিম ওয়ার্কের মতো। সেখানে সকলের না হলেও বেশিরভাগ সদস্যের সহযোগিতা থাকা লাগে। ২০০৫-১৬ অর্থবছরে শিক্ষা প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের যে চিত্র দেখা গেছে, তাতে অপচয়ের যে ধারণা জনগণ পেয়েছেন, তাতে মন্ত্রণালয়ের মান ক্ষুণ্ন হবে না বৃদ্ধি পাবে তা সময়ই বলে দেবে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কি চিত্র তা বলতে পারবো না। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। সব উন্নয়ন-অগ্রগতির মূলে শিক্ষা। জাতি শিক্ষিত না হলে দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ সত্যটা সকলেই উপলব্ধি করেন। কিন্তু এ সমস্যাবলি দূর করার ক্ষেত্রে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখি না। পাহাড় সমান সমস্যা নিয়ে কোন ব্যবস্থাকে যেমন এগিয়ে নেয়া যায় না, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হলে জনকল্যাণমুখী প্রকল্প হাতে নেয়া দরকার। অপরিকল্পিত ও অহেতুক প্রকল্পে টাকা নষ্ট না করে তা কল্যাণকর খাতে ব্যয় করা দরকার। এক্ষেত্রে কাকে কি বলব। কারো ওপর ভরসারও জায়গা নেই। একমাত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক হাতে আর কতদিকে সামলাবেন। তবু ভরসা শত কাজের মাঝেও তিনি সবদিক দেখছেন।

[লেখক : অধ্যাপক, সাংবাদিক, কলামিস্ট]